আজকের কাগজ
তারিখ 07 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আবার আঘাত

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

মানুষের জীবনের মূল্য যে কতখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে নিয়ে গেছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেছে গত সোমবারের (নভেম্বর ১) ঘটনার মধ্যে দিয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে। এই ঘটনা অপ্রত্যাশিত কি-না তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বিবেচনা করা কঠিন। সম্ভবত, অপ্রত্যাশিত নয়। তার কারণ, কোন ঘটনাই আকস্মিকভাবে ঘটে না; তার পেছনে একটা কার্যকারণ থাকে। এই কার্যকারণও লোক মুখে কিছুটা প্রচারিত হয়েছে। সে সম্পর্কে পরে আলোকপাত করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীকে বিশেষভাবে চিন্তিত করেছে। এর আগে এই ধরনের যে ঘটনা ঘটেছিল তার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। আগে সন্ত্রাস ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ছাত্রদের মধ্যে সহিংস আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও কেউ কাউকে সাধারণভাবে হত্যা করত না। উভয় দলই উভয় দলকে ভয় দেখাত। এটাই ছিল স্বাভাবিক রীতি। এছাড়া, ছাত্রসন্ত্রাস ছাত্রাবাসের বাইরে অন্যদের ওপর আঘাত করত না। গতকালের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এদিক দিয়ে দু'টি কারণে স্বতন্ত্র। প্রথমত, এবার সন্ত্রাস ছাত্রাবাস অতিক্রম করে প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম প্রতিপক্ষের একজন ছাত্র নিহত হওয়ার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছেন।

বাংলাদেশ জন্মের পর থেকেই এদেশে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক আমল থেকে অন্য আমলে শাসনতান্ত্রিক কাজের উত্তরণ ঘটলেও সন্ত্রাস যে হ্রাস পেয়েছে একথা বলা যাবে না। ছাত্ররা সন্ত্রাস করে থাকে- এই মতও সার্বিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। তার কারণ, অনেক তরুণই সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হলেও তারা সবাই ছাত্র নয়। বয়সের জন্যে তরুণদের ছাত্র বলে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা থাকলেও তা সমর্থনযোগ্য নয়। এখানে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হল, সন্ত্রাসের কারণ কি? এর একাধিক উত্তর থাকতে পারে। এখানে সম্ভাব্য দু'টি কারণের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, আর্থিক দিকের প্রতি আকর্ষণ। যে কোন ধরনের সন্ত্রাসের ক্ষেত্রেই যে এ দু'টি দিক প্রধান এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কম।

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি একটি প্রত্যাশিত দিক। এ দেশের ছাত্র সমাজ ব্রিটিশ প্রতিরোধের আন্দোলনের সময় থেকে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চা করে এসেছে। শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘদিন ছাত্র-রাজনীতি বন্ধের পক্ষে অনেকে মত প্রকাশ করলেও বর্তমান প্রসঙ্গে তার পক্ষে বা বিপক্ষে মত দেওয়া প্রয়োজনীয় না হলেও একটি দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা ভবিষ্যতে তাদের রাজনীতি অঙ্গনে প্রবেশের পথ সহজ করে দেয়। বিশেষত, অনেক ছাত্রই ভবিষ্যতে রাজনীতি ক্ষেত্রে নামার আকাংক্ষায় সক্রিয়ভাবে রাজনীতি চর্চায় অগ্রসর হয়। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চার অবাধ অধিকার থাকলেও তা কোন রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে ছাত্রদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে একদিকে গতি ফেরাতে সহায়তা করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ পরোক্ষ হলে রাজনৈতিক চিন্তাধারার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটান সম্ভব।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কম যে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সন্ত্রাস সমার্থক নয়। যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির

> বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রথায়
> নির্বাচিত সরকারের কাছে দেশের
> জনসাধারণের অনেক আশা।
> সরকার যদি অপরাধীদের সনাক্ত
> করে দল নির্বিশেষে দৃষ্টান্তমূলক
> শাস্তির ব্যবস্থা করেন তা হলে
> দেশবাসী বিপদমুক্ত হবেন এবং
> সেই সঙ্গে সরকারের সাফল্য
> ঘোষিত হবে। যে কোন সরকারের
> এর চেয়ে বড় বিজয় আর
> হতে পারে না।

সঙ্গে জড়িত, তারা সাধারণত সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত হতে চায় না। তার কারণ, সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর নিজেকে সেই বৃত্ত থেকে বের করে নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। তার কারণও আছে। সহিংসতার প্রতিরোধ সহিংসতার দ্বারাই সম্ভব। অন্তত, আমাদের ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে এই প্রকৃতিই লক্ষ্য করা যায়।

ছাত্র সন্ত্রাসের সঙ্গে আর্মড ক্যাডারদের সম্পর্কই প্রত্যক্ষ। অনেক সময় অন্যদের সাহায্যার্থে আর্মড ক্যাডার পাশে এসে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আর্মড ক্যাডারদের স্বতন্ত্র ভূমিকা ও স্বার্থ বিদ্যমান। এদের সিংহভাগ সদস্যই বা নেতৃস্থানীয়রা চাঁদা আদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহনির্মাণের সময় এরা কনট্রাকটারদের কাছ থেকে নির্মাণযোগ্য ব্যয়ের খাত থেকে একটি অংশ চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কনট্রাকটররা এই চাঁদা নিরুপায় হয়েই দিতে বাধ্য হয়। তার কারণ, এই চাঁদা ছাড়া তাদের পক্ষে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। চাঁদাবাজদের এই দৌরাত্ম্য থেকে কনট্রাকটরদের রক্ষার জন্যে দু'একটি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। অনেক কনট্রাকটর চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করার পর দীর্ঘদিন নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে থাকে। এতে কর্তৃপক্ষ ও কনট্রাকটর উভয় পক্ষেরই ক্ষতি সাধিত হয়।

সন্ত্রাসী পক্ষ আরও একটি ক্ষেত্রে নিজেদের হাত প্রসারণ করে। এটা হল টেন্ডারের সময়। প্রায়ই দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে সশস্ত্র ছাত্রদল টেন্ডার জমা দেয় এবং টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার গৃহীত না হলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই দিকটি বহুদিন থেকে চলে এলেও এর প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ছাত্রদের মধ্যে যারা সশস্ত্র তাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন জমা হয়ে থাকে। তার মধ্যে দু'টি প্রধান। প্রথমটি হল, ছাত্রদের সশস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে কারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং দ্বিতীয়টি হল, সরকারী কর্তৃপক্ষ এদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকার কারণ কি? দু'টি প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের সময় বাড়ি থেকে কোন রকমের অস্ত্র বহন করে আনে না।

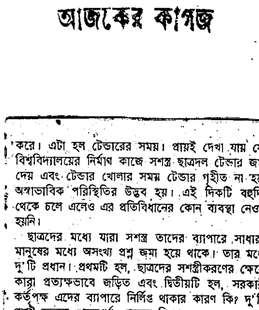

শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের পরই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়। এই অস্ত্র দু'ভাবে তাদের হাতে আসা সম্ভব- সরকারের পক্ষ থেকে, অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। সরকার বা রাজনৈতিক দল ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে কোন শিক্ষাঙ্গনে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্যে। তার ফলে একদা নিরীহ ছাত্র পরিণত হয় সন্ত্রাসীরূপে। অস্ত্র হাতে তোলার পর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিকেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই আধিপত্য প্রথমে সীমাবদ্ধ থাকে নেতৃত্বের দলাদলিতে, তারপর ক্রমশ বিস্তৃত হয় অর্থ উপার্জনের পথে। নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল আর যাই হোক না কেন; দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না। যেখানে আনুগত্যের অভাব, সেখানে দলীয় আদর্শ প্রতিফলিত হওয়ার কোন সুযোগ পায় না। অস্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস অর্থ উপার্জনের অবৈধ পথে নামিয়ে তার ক্রমশ বিস্তার ঘটাতে থাকে। তখনই সংঘাত স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হয়। তখন আর তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় না।

নভেম্বরের এক তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের যে আগুন বিস্তৃত হয়েছে তার ভয়াবহতায় সবাই নিজেদের জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্ধিহান হয়ে উঠেছেন। সন্ত্রাসের যে হাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারীকে অনায়াসে আঘাত করতে পারে, তা অনায়াসেই একজন শিক্ষককেও আঘাত করতে পারে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আর শিক্ষা বর্তমানে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা সহজেই অনুমেয়। এই সন্ত্রাস যে- কোন সময়ে যে- কোন মানুষকে বিদ্ধ করতে পারে। সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি রাখার জন্যে কি একজন অভিভাবক তাঁর সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন? সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে কি একজন কর্মচারী ও শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে ও শিক্ষা দিতে এসেছেন? সন্ত্রাস ও শিক্ষার পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব নয়। মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে অন্যায়ের বিরোধিতা করতে, অন্যায়কে লালন করতে নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পয়লা নভেম্বরের দুঃখজনক ঘটনার নেপথ্য দিক আরও দুঃখজনক। যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে ও যারা আক্রমণকারী তারা অছাত্র বলে জানা গেছে। এই তথ্য যদি প্রকৃত হয় তাহলে এই ঘটনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। বহিরাগতরা কিভাবে সশস্ত্র হয়ে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে? তাহলে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল সশস্ত্র বহিরাগতদের নিরাপদ স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে? এই সঙ্গে এর পেছনের কারণও আবিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্র্যাজেডির পেছনে একই ছাত্র সংগঠনের দু'টি বিবদমান দল যুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যেই কিছুদিন থেকে নেতৃত্বের সংঘাতে ক,খ,গ ইত্যাদি ভাগে বিভক্তিকরণ লক্ষ্য করা গেছে। এর কারণ একটাই- দলগত আদর্শের অভাব। ছাত্রদের মধ্যে নিষ্ঠা, আদর্শবোধ ও শ্রদ্ধাবোধ থাকলে দলের মধ্যে দল- এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। সরকার ও বিভিন্ন দলের পক্ষে এই দিকটির প্রতি বিশেষ লক্ষ দেয়ার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসেছে।

স্বাধীনতার পর শিক্ষাঙ্গনে কম হত্যাকান্ড সাধিত হয়নি। অথচ দুঃখের ব্যাপার হল যে, বিভিন্ন সময়ে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে সেক্ষেত্রে হত্যাকারীরা শাস্তি পায়নি এবং তাদের চিহ্নিত করা হয়নি। এই দিকটি সরকারী প্রশাসনের দুর্বল দিক তুলে ধরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত কয়েক বছর ধরে চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ প্রহরাধীন থাকে। পুলিশের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে কিভাবে হত্যাকান্ড সাধিত হয় সে উত্তর আমাদের অজ্ঞাত দেশের গুপ্তচর বিভাগও রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করেন। তারপরও দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে কিভাবে সন্ত্রাসী কাজ অবাধে চলতে থাকে-এ প্রশ্ন দেশের মানুষ উত্থাপন করতে থাকেন। তাঁরা কি এর প্রতিকারের জন্যে কোন পথ খুঁজে পান না? এ দেশের পুলিশ কর্তৃপক্ষ চোর, পকেটমার থেকে শুরু করে সন্ত্রাসীদের সব খবরই রাখতে সক্ষম। যাঁরা দেশের সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করতে পারেন তাঁরা কি সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গঠন করতে অপারগ? এর উত্তর সম্ভবত না। তাঁরা ইচ্ছা করলেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দেশ থেকে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনে সক্ষম। সন্ত্রাস দূর করতে অগ্রসর হলে কি তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে দেয়া হবে, কিংবা আটকে থাকবে প্রমোশন? এসব জটিলতা থেকে পুলিশ বিভাগকে মুক্ত করে সন্ত্রাস দমনে স্বাধীনতা না দিলে দেশ থেকে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত সরকারের কাছে দেশের জনসাধারণের অনেক আশা। সরকার যদি অপরাধীদের সনাক্ত করে দল নির্বিশেষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন তা হলে দেশবাসী বিপদমুক্ত হবেন এবং সেই সঙ্গে সরকারের সাফল্য ঘোষিত হবে। যে কোন সরকারের এর চেয়ে বড় বিজয় আর হতে পারে না।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ঃ প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।